ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বাংলাদেশের অধস্তন আদালত ব্যবস্থা: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

৩০ নভেম্বর ২০১৭

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

বাংলাদেশের অধস্তন আদালত ব্যবস্থা: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

গবেষণা উপদেষ্টা
ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের
উপদেষ্টা - নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক - রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা তত্ত্বাবধান
এ এস এম জুয়েল, *সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার - রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি*

গবেষণা এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন
নাজমুল হুদা মিনা, *অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি*
নাহিদ শারমিন, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার - রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি*
শাম্মী লায়লা ইসলাম, *প্রোগ্রাম ম্যানেজার - রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি*

সহযোগিতায়
আবু সালেহ মো. সাদ্দাম, *মাঠ সহকারি*
লুৎফর রহমান, *মাঠ সহকারি*

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন
গবেষণা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও মতামত দিয়ে সহায়তা করার জন্য সম্মানিত বিচারক, আইনজীবী, বিচারিক কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি অংশীজন, গণমাধ্যম কর্মী ও এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। এ গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে পরামর্শ প্রদান ও প্রতিবেদনের গুণগতমান বৃদ্ধিকরণে সহযোগিতার জন্য টিআইবি'র সহকর্মীদের জানাই অশেষ ধন্যবাদ। এছাড়াও সকল তথ্যদাতার প্রতি রইল বিশেষ কৃতজ্ঞতা।

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬(নতুন) ২৭(পুরাতন), ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: ৮৮০-২-৯১২৪৭৮৮-৮৯, ৯১২৪৭৯২
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯১২৪৯১৫
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

সার-সংক্ষেপ

১. ভূমিকা

১.১ গবেষণার প্রেক্ষাপট

রাষ্ট্রের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের একটি বিচার বিভাগ। বাংলাদেশের বিচারিক কাঠামোয় অধস্তন আদালতসমূহ বিচারিক সেবা প্রদানের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তর। সাধারণত বেশিরভাগ মামলাই এই পর্যায়ের নিম্নতম ও এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে শুরু হয়। বাংলাদেশ সংবিধানের ষষ্ঠ ভাগের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে (অনুচ্ছেদ ১১৪-১১৬ক) অধস্তন আদালত অধস্তন আদালতসমূহ প্রতিষ্ঠা, নিয়োগ, নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা, দায়িত্ব পালনে স্বাধীনতা সম্পর্কে বর্ণিত আছে। স্থানীয় পর্যায়ের জেলা ও দায়রা জজ আদালত, মহানগর দায়রা জজ আদালত, চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত (সিজেএম), মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত (সিএমএম), বিভিন্ন বিশেষ আদালত (যেমন- স্পেশাল জজ আদালত, বন আদালত ইত্যাদি) ও ট্রাইব্যুনাল (যেমন- নারী ও শিশু ট্রাইব্যুনাল, ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল ইত্যাদি) এই অধস্তন আদালতের অন্তর্ভুক্ত।

দেশে বিচারাধীন বা মোট মামলার বেশিরভাগই (৮৬%) দেশের এই অধস্তন আদালতগুলোতে বিচারাধীন রয়েছে। এই আদালতগুলোতে দরিদ্র ও অসহায় বিচারপ্রার্থীসহ আপামর বিচারপ্রার্থী জনগণ প্রতিদিন আসে ন্যায়বিচার প্রাপ্তির আশায়। বাংলাদেশ সংবিধানের ২২ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রের নির্বাহী অঙ্গসমূহ হতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে। নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের সূচনা ১৯৯৯ সালের ২ ডিসেম্বর মাজদার হোসেন মামলায় সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের প্রদত্ত রায়ের মাধ্যমে (৫২ ডিএল আর ২০০০)। এই রায় ঘোষণার ৮ বছর পর ২০০৭ সালের ১ নভেম্বর থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ কার্যকর হয়।

গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগসহ জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলো নিজস্ব কর্মপরিধিতে 'ওয়াচডগের' ভূমিকা পালনের মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনা তথা সমাজের সর্বস্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান যে দেশে যত বেশি স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে, সে দেশে তত বেশি গণতন্ত্র ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় অগ্রগতি অর্জিত হয়। বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের জন্য এবং যথাসময়ে ফলাফল প্রাপ্তির জন্য সুশাসন ও প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বকে সম্যক বিবেচনায় রেখে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিচার বিভাগকে শক্তিশালী করার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলাসমূহের দ্রুত নিষ্পত্তি নিশ্চিত করতে বিচার বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ এর অনুকূলে আর্থিক ও আইনি সমর্থন দানের বলা হয়েছে। এছাড়া জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্রেও রাষ্ট্রের একটি স্বাধীন, কার্যকর ও নিরপেক্ষ অঙ্গ হিসেবে বিচার বিভাগের প্রতিষ্ঠা লাভের কথা বলা হয়েছে। অন্যদিকে জাতিসংঘ প্রণীত টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রায় ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য সমান বিচার প্রাপ্তির অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণ এবং সকল পর্যায়ে কার্যকর, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠান গঠনের বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে।

দেশের আদালতসমূহের উৎকর্ষ ও কার্যকরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ও জেলা জজ আদালত ভবন নির্মাণ ও উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণে প্রকল্প গ্রহণ, কেস ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠন, মামলা নিষ্পত্তির জন্য সময় নির্ধারণ ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মামলা নিষ্পত্তির নির্দেশনা, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের a2i প্রোগ্রাম এর যৌথ উদ্যোগে বিচার বিভাগীয় তথ্যবাতায়ন, সকল জেলার আদালতের জন্য ওয়েবসাইট তৈরি, আদালত ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার প্রবর্তন ও প্রসার, তিন বছর মেয়াদী ই-জুডিসিয়ারি প্রকল্প গ্রহণ, বিচারকদের ছুটি ও কর্মস্থল ত্যাগের বিষয়টি সহজীকরণের লক্ষ্যে e-Application software চালু, বিচারিক কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তি ব্যবস্থা চালু, দরিদ্র ও অসহায় বিচারপ্রার্থীদের সরকারি খরচে আইনগত সহায়তা প্রদান, জাতীয় হেল্পলাইন স্থাপন, আদালত প্রাঙ্গণে আইনগত সহায়তার তথ্য সম্বলিত বিলবোর্ড স্থাপন, কয়েকটি জেলার আদালত ভবনে মাতৃদুগ্ধ পান কক্ষের ব্যবস্থা, আদালত কক্ষের বাইরে বসার ব্যবস্থা, কক্ষ নির্দেশিকা টাঙ্গানো, মামলার তালিকা টাঙ্গানো, নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সিসি ক্যামেরা স্থাপন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া আদালতগুলোর কার্যকরতা ও উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে বেসরকারি পর্যায়েও (যেমন- ইউএনডিপি, ইউএসএইডসহ অনান্য) নানা উদ্যোগ রয়েছে।

এ ধরনের নানা সংস্কার কার্যক্রম ও ইতিবাচক উদ্যোগ থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন ও গণমাধ্যমে দেশের আদালত ব্যবস্থায় সুশাসনের ঘাটতি ও নানা সীমাবদ্ধতার চিত্র উঠে আসে। এছাড়া বিভিন্ন সময়ের প্রধান বিচারপতিদের বক্তব্যেও বিচার ব্যবস্থার নানা সীমাবদ্ধতার বিষয়গুলো প্রতিফলিত হয়েছে। দেশের অধস্তন আদালতসমূহে বিচারকের শূন্য পদ, বিশেষ আদালতসমূহে স্থান সংকুলানের তীব্র অভাব, ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের অবকাঠামো সমস্যা, দেশের বিভিন্ন আদালতে ব্যবহৃত বিভিন্ন ফরম সরবরাহে অপ্রতুলতা, মামলা জট, উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাবসহ আইনী সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা ও দুর্নীতির বিষয়গুলোও বিভিন্ন সময়ে উঠে এসেছে।

"জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০১২"-এ স্বচ্ছ নিয়োগ পদ্ধতি প্রবর্তন, বিচার বিভাগের অধিকতর আর্থিক স্বায়ত্বশাসন, বিচারকগণের দায়বদ্ধতা অধিকতর দৃশ্যমান করা, বিচার বিভাগ সম্পর্কে জনগণের ধারণা উজ্জ্বলতর করা, বিচারক-মামলা অনুপাতের উন্নয়ন সাধন, যৌক্তিক সময়ে মামলার নিষ্পত্তির বিষয়গুলোকে বিচার ব্যবস্থার চ্যালেঞ্জ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। একইভাবে ২০১৪ সালের ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের 'জাতীয়

শুদ্ধাচার ব্যবস্থার বিশ্লেষণ: বাংলাদেশ' শীর্ষক গবেষণায় বলা হয়েছে যে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ আনুষ্ঠানিকভাবে পৃথক হলেও নির্বাহী বিভাগ কর্তৃক অধস্তন আদালতসমূহ এখনও প্রভাবিত হওয়ায় সত্যিকারের স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিচার বিভাগের প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে জনআকাঙ্ক্ষা এখনো পূরণ হয়নি। সকল সরকারের সময়েই বিচার বিভাগ অব্যাহত হারে রাজনৈতিকভাবে দলীয়করণ হওয়ায় বিতর্কিত নিয়োগ, পদোন্নতি, চাকুরিচ্যুতি এবং বিচারকদের আচরণের মাধ্যমে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সার্বিকভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে। এছাড়া ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের বিভিন্ন বছরের (২০১০, ২০১২, ২০১৫) সেবা খাতে দুর্নীতি শীর্ষক জাতীয় খানা জরিপেও তথ্যদাতারা বিচারিক সেবা খাতকে অন্যতম প্রধান দুর্নীতিগ্রস্ত খাত হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ইউএনডিপি'র (২০১৫) একটি প্রতিবেদনে দেখা যায়, বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থার প্রধান প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে পদ্ধতিগত জটিলতা, মামলাজট এবং ফলপ্রসূ মামলা ব্যবস্থাপনার অভাব। ইউএনডিপি (২০১৫) পরিচালিত জেলা আদালতের উপর একটি খানা জরিপে দেখা যায়, ৩১ শতাংশ জনগণ মনে করেন বিচার ব্যবস্থায় দুর্নীতি বিদ্যমান।

১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা

দেশের আদালতসমূহের কার্যকরতা বৃদ্ধি ও সাধারণ জনগণের ন্যায়বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত করার স্বার্থে অধস্তন আদালতের বিচারিক ব্যবস্থায় সুশাসনের ঘাটতিসমূহ চিহ্নিত করে সেগুলো দূর করা অত্যন্ত জরুরী। টিআইবি বিচার ব্যবস্থার গুরুত্ব বিবেচনায় দীর্ঘদিন যাবৎ দেশের বিভিন্ন আদালত ও বিচারিক সেবা খাত নিয়ে গবেষণা (দ্রুত বিচার আদালত, রিপোর্ট কার্ড জরিপ ও জাতীয় খানা জরিপ) এবং তার আলোকে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এ সকল কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় এবং অধস্তন আদালত ব্যবস্থায় সুশাসন নিশ্চিতকরণের গুরুত্ব অনুধাবন করে এ ব্যবস্থায় বিরাজমান চ্যালেঞ্জ চিহ্নিতকরণ ও তা থেকে উত্তরণের উপায় অনুসন্ধানে এই গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা নিয়ে সার্বিকভাবে নানা গবেষণাকর্ম থাকলেও সুনির্দিষ্টভাবে অধস্তন আদালত ব্যবস্থায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জকেন্দ্রিক গবেষণাকর্মের ঘাটতি রয়েছে। এ গবেষণাটি অধস্তন আদালত ব্যবস্থায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা, অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং গৃহীত সংস্কার কার্যক্রমকে টেকসই করার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার সার্বিক উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের অধস্তন আদালত ব্যবস্থায় বিদ্যমান সুশাসন পরিস্থিতি পর্যালোচনা, চ্যালেঞ্জ চিহ্নিতকরণ এবং তা থেকে উত্তরণে সুপারিশ প্রদান করা। এই গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো হলো:

১) বাংলাদেশের অধস্তন আদালত ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা;

২) বাংলাদেশের অধস্তন আদালত ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও শুদ্ধাচার চর্চার বিদ্যমান অবস্থা পর্যালোচনা ও চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা; এবং

৩) অধস্তন আদালত ব্যবস্থায় সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কার্যকর ও বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশ প্রদান করা।

১.৪ গবেষণা পরিধি

এই গবেষণায় অধস্তন আদালত ব্যবস্থা বলতে অধস্তন আদালত এবং অধস্তন আদালত ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের কার্যক্রম বোঝানো হয়েছে। এই গবেষণায় অধস্তন আদালত ব্যবস্থার জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের অধস্তন আদালত, যেমন- জেলা ও দায়রা জজ আদালত, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, মহানগর দায়রা জজ আদালত, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ও কিছু বিশেষ আদালত ও ট্রাইব্যুনাল ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই গবেষণায় অধস্তন আদালত ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনদের প্রাসঙ্গিক কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ গবেষণায় সুশাসনের প্রধান কয়েকটি নির্দেশকের (সক্ষমতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, ও শুদ্ধাচার) আলোকে নমুনায়নের মাধ্যমে নির্বাচিত কয়েকটি জেলা ও মহানগর এলাকায় অবস্থিত আদালত ব্যবস্থার ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, গবেষণায় উপস্থাপিত পর্যবেক্ষণ অধস্তন আদালত ব্যবস্থার সকল অংশীজন তথা সকল বিচারক, কর্মকর্তা-কর্মচারী, আইনজীবী ও অন্যান্য অংশীজনের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়, তবে অধস্তন আদালত ব্যবস্থার বিদ্যমান সুশাসনের চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে একটি নির্দেশনা প্রদান করে।

২. গবেষণা পদ্ধতি

এটি মূলত একটি গুণগত গবেষণা। তথ্য সংগ্রহের জন্য দেশের ৮টি বিভাগের প্রতিটি থেকে দুটি করে মোট ১৬টি জেলা নির্বাচন এবং দুটি বিভাগ থেকে বিশেষ বিবেচনায় অতিরিক্ত একটি করে আরো দুটি জেলা, এভাবে মোট ১৮টি জেলা নির্বাচন করা হয়েছে। এই ১৮টি জেলা বা এলাকার অধস্তন আদালতের ওপর আদালত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনের নিকট থেকে গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। জেলা নির্ধারণের ক্ষেত্রে মামলার সংখ্যার আধিক্য বিবেচনা করা হয়েছে। এছাড়া জাতীয় পর্যায়েও অধস্তন আদালত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনের নিকট থেকে গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

গবেষণায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্যের প্রত্যক্ষ বা প্রাথমিক উৎসের মধ্যে রয়েছে অধস্তন আদালত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজন যেমন- অধস্তন আদালতের বিভিন্ন পর্যায়ের বিচারক ও কর্মকর্তা-কর্মচারী, জেলা আইনগত সহায়তা কর্মকর্তা, আইনজীবী (রাষ্ট্রপক্ষীয় আইনজীবীসহ), জেলা বার সমিতির সভাপতি, আইনজীবীর সহকারী/মুহুরী, বিচারপ্রার্থী, বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের কর্মকর্তা, জেলা আইনগত সহায়তা সংস্থার কর্মকর্তা, দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মকর্তা, এনজিও প্রতিনিধি, ও গণমাধ্যম কর্মী। অপরদিকে পরোক্ষ তথ্যের উৎসের মধ্যে রয়েছে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি, প্রাসঙ্গিক গবেষণা প্রতিবেদন, অধস্তন আদালত থেকে সংগৃহীত তথ্য এবং গণমাধ্যম ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত

তথ্য, সংবাদ ও প্রবন্ধ। এ গবেষণায় মূলত গুণগত তথ্য ব্যবহার করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন ধরনের গুণগত তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি যেমন- সাক্ষাৎকার, দলীয় আলোচনা ও পর্যবেক্ষণ ব্যবহার করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য চেকলিস্ট ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে সুপ্রীম কোর্ট ও মন্ত্রণালয়ে আনুষ্ঠানিক অনুরোধসহ যোগাযোগ করেও কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি বিধায় তাদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

মাঠ পর্যায়ের তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সম্পাদনা করা হয়েছে এবং এসব তথ্য কমপক্ষে তিনটি ভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করে এর সত্যতা যাচাই করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্যের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য তথ্য সংগ্রহের সময় সার্বক্ষণিকভাবে মাঠে অবস্থান করে তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণ করা হয়। এ গবেষণায় অধস্তন আদালত ব্যবস্থার ২০১৪-২০১৬ সময়কালের সুশাসনের চিত্র বিবেচনা করা হয়েছে। ২০১৭ সালের জানুয়ারী থেকে শুরু করে অক্টোবর পর্যন্ত সময়কালে এ গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়।

৩. গবেষণা ফলাফল

৩.১ অধস্তন আদালত ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা

আইনী সীমাবদ্ধতা: এ গবেষণায় অধস্তন আদালত সংশ্লিষ্ট কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে কিছু আইনী সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে ১০৯, ১১৫ ও ১১৬ অনুচ্ছেদগুলোতে একদিকে অধস্তনসহ সকল আদালত ও ট্রাইব্যুনালের ওপর হাইকোর্ট বিভাগের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ এবং অপরদিকে অধস্তন আদালতের বিচারকদের নিয়োগ এবং তাদের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা বিধানের দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। রুলস অব বিজনেস, ১৯৯৬ অনুযায়ী আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ অধস্তন আদালত ও ট্রাইব্যুনালসমূহের প্রশাসনিক, বিচারক নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ও তাদের কর্মের শর্তাবলী নির্ধারণ সরকারি কৌঁসুলী ও পাবলিক প্রসিকিউটার নিয়োগ ও তাদের কর্মের শর্তাবলী নির্ধারণসহ অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন করে। এর ফলে অধস্তন আদালতের ওপর একই সাথে সুপ্রীম কোর্ট এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান থাকায় দ্বৈত প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বিরাজ করছে। এছাড়া বিচারকদের চাকুরীর শৃঙ্খলা ও আচরণ বিধিমালা এখনো গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়নি। এছাড়া তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৬-এর ধারা ১৩ (পদের পূর্ণ বেতন প্রাপ্তির শর্তাবলী) এর কারণে কিছু ক্ষেত্রে পদোন্নতি পাওয়ার পর পদ অনুযায়ী বেতন-ভাতা পাওয়া যাচ্ছে না। বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৬-এর ধারা ১৩ এ বলা হয়েছে যে, কোনো সদস্য কোনো উচ্চতর পদে ও বেতন স্কেলে পদোন্নতি পেলে বা পাওয়ার ক্ষেত্রে ঐ পদে পূর্ণ বেতন পাওয়ার জন্য তাকে প্রয়োজনীয় ন্যূনতম চাকরির মেয়াদ পূর্ণ করতে হবে। এই শর্ত আরোপ করায় বিচারকগণ পরবর্তী পদে পদোন্নতি পাওয়ার পরও পদ অনুযায়ী বেতন-ভাতা পাচ্ছেন না। অন্যদিকে বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় বিচার বিভাগের অংশগ্রহণের বিধান কোনো আইনে সুস্পষ্ট নেই। এছাড়া কিছু ক্ষেত্রে আইনগুলোতে মামলা নিষ্পত্তির জন্য সুনির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ না করা এবং প্রয়োজনীয় সংস্কারের ঘাটতি রয়েছে। ফলে কিছু ক্ষেত্রে বিচারিক প্রক্রিয়া শেষ করার ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা তৈরি হতে পারে।

দ্বৈত প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ফলে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জ: অধস্তন আদালতের ওপর একই সাথে সুপ্রীম কোর্ট, এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ অধস্তন আদালত ব্যবস্থায় কার্য সম্পাদনে কিছু কিছু ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে। অধস্তন আদালত সংক্রান্ত কোনো উদ্যোগ বা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দু'টি প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক সমন্বয়ের ঘাটতির কারণে কিছু ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় না এবং সময়ক্ষেপণ হয় বলে তথ্য পাওয়া গেছে। এ কারণে কিছু ক্ষেত্রে বদলি, পদোন্নতি, ছুটি, কোনো প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে দীর্ঘসূত্রতার সৃষ্টি হয়। এছাড়া দ্বৈত প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ফলে কিছু ক্ষেত্রে প্রশাসনিক দ্বন্দ্বও সৃষ্টি হয়। এছাড়া দেখা যায় যে, মন্ত্রণালয়ের কোনো সিদ্ধান্ত বা প্রস্তাবে সুপ্রীম কোর্ট তা নাকচ করে দেওয়ার পরও মন্ত্রণালয় তা বাস্তবায়ন করে এবং এতে করেও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। যেমন- এ বছর সুপ্রীম কোর্টের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও প্রেষণে কর্মরত বিচারিক কর্মকর্তাদের বিদেশে প্রশিক্ষণে যাওয়ার একটি বিষয় নিয়ে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়েছে। অন্যদিকে দ্বৈত প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণের কারণে প্রকৃত অর্থে কার্যকরভাবে বিচার বিভাগ পৃথককরণে কিছু চ্যালেঞ্জ পরিলক্ষিত হয়েছে তথ্যদাতারা মত প্রকাশ করেছেন। তারা বলছেন যে, পৃথকীকরণের পূর্বে বিচারকদের নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতির বিষয়গুলো সংস্থাপন ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের হাতে ছিল এবং বর্তমানে তা আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে অর্থাৎ সরকারের অধীনেই রয়েছে যা কিছু ক্ষেত্রে অধস্তন আদালত ব্যবস্থার কার্যক্রম প্রভাবিত করার ঝুঁকি সৃষ্টি করছে।

অবকাঠামোগত ঘাটতি: গবেষণার আওতাধীন অধস্তন আদালতগুলোর অবকাঠামোর ঘাটতি রয়েছে। গবেষণার অর্ন্তভুক্ত অধিকাংশ এলাকায় দেখা গেছে যে চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনের নির্মাণ কাজ এখনো শুরু হয়নি বা শুরু হলেও এখনো নির্মাণ কাজ শেষ হয়নি বা শেষ হলেও এখনো সে ভবনে কার্যক্রম শুরু হয়নি। এছাড়া সময় ও বিষয়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে নতুন নতুন আদালত (যেমন- ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল, তৃতীয় যুগ্ম জেলা জজ আদালত ইত্যাদি) সৃষ্টি করা হলেও অনেক ক্ষেত্রেই এসব আদালতের জন্য পৃথক আবকাঠমো সুবিধা নিশ্চিত করা হয়নি। গবেষণার আওতাধীন ১৮টি এলাকার মধ্যে ৭টিতে নতুন চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে, ৬টিতে এখনো শুরু হয়নি, ৫টির নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে এবং সেগুলোতে বিচারিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। পৃথক জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন না থাকায় এই আদালতগুলোকে জেলা ও দায়রা জজ আদালত ভবন, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ভবনের কক্ষে কার্যক্রম পচিালনা করতে হচ্ছে যা অনেক ক্ষেত্রেই বিচারিক কার্য পরিচালনার জন্য উপযোগী নয়। এছাড়া বিদ্যমান আদালত ভবনগুলোর (নতুন ভবন ব্যতীত) বিভিন্ন অংশ ভাঙ্গা বা স্যাঁতসেঁতে যেখানে প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংস্কার কার্যের ঘাটতি রয়েছে।

আদালতগুলোতে কক্ষ সংকট রয়েছে এবং এ কারণে অনেক আদালতেই বিচারকের সংখ্যা অনুপাতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক এজলাস কক্ষ নেই। ফলে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় দুই জন বিচারককে একটি এজলাস কক্ষ ভাগাভাগি করে বিচার কাজ পরিচালনা করতে হয়। এজলাস কক্ষ ভাগাভাগি করার ফলে একজন বিচারক তার পুরো কর্মঘন্টার সর্বোচ্চ সময় বিচার কার্যে ব্যয় করতে পারেন না। কারণ তাকে পরবর্তী বিচারকের জন্য এজলাস ছেড়ে দিতে হয়। এর ফলে কিছু ক্ষেত্রে মামলার বা সাক্ষীর শুনানী করা সম্ভব হয় না এবং উক্ত মামলার একটি পরবর্তী তারিখ নির্ধারিত হয়। এর ফলশ্রুতিতে মামলাটি দীর্ঘসূত্রতার মধ্যে পড়ে যায়। এছাড়া বিচারপ্রার্থীর ঐ দিনের যাতায়াত, খাওয়ার খরচ, উকিল খরচসহ অন্যান্য যাবতীয় খরচ হলেও বিচার প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় কাজ পড়েই থাকে। এতে করে মামলা পরিচালনার ব্যয় বৃদ্ধি পায়। একইভাবে বিভিন্ন আদালতের রেকর্ডরুম, মালখানায়ও স্থান সংকট রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে ভবন পুরোনো হওয়ায় কক্ষগুলো স্যাঁতস্যাঁতে এবং সেগুলোতে উইপোকার উপদ্রব রয়েছে। ফলে আসবাবপত্র ও গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে। এছাড়া অনেক ক্ষেত্রে আদালতগুলোতে দায়িত্বরত পুলিশদের অবস্থান ও কার্য পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা নেই। এছাড়া আদালত প্রাঙ্গণে বিচারপ্রার্থীদের বসার স্থান ও শৌচাগারের অপ্রতুলতা রয়েছে। নারীদের জন্য পৃথক শৌচাগার ব্যবস্থা এবং প্রতিবন্ধী বিচারপ্রার্থীদের জন্য কোনো বিশেষ ব্যবস্থা (লিফটের ব্যবস্থা না থাকা বা থাকলেও সচল না থাকা) নেই। অপরদিকে আদালত প্রাঙ্গণে আইনজীবীদের বসার স্থানের অপ্রতুলতা রয়েছে।

আর্থিক বরাদ্দের ঘাটতি: অধস্তন আদালতগুলোতে বাজেটের স্বল্পতা রয়েছে। অধস্তন আদালত থেকে অর্থ বরাদ্দের জন্য চাহিদা প্রেরণের ব্যবস্থা নেই। মন্ত্রণালয় থেকে বাৎসরিক যে বাজেট পাঠানো হয় তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল এবং প্রায়শই কিছু খাতভিত্তিক (যেমন- লজিস্টিকস, যানবাহন, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি) বাজেট শেষ হয়ে যাওয়ায় আদালতগুলোকে মন্ত্রণালয়ের কাছে কন্টিনজেন্সি বাজেট চাইতে হয়। এছাড়া বিভিন্ন ভাতা (যেমন - সমন জারির যাতায়াত ভাতা, রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের ভাতা) বর্তমান সময়ের বাজার মূল্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

লজিস্টিকস ঘাটতি: অধস্তন আদালতে অবকাঠামোগত ঘাটতির পাশাপাশি প্রয়োজনীয় উপকরণেরও (আসবাবপত্র, কম্পিউটার, প্রিন্টার, ফরম, যানবাহন ইত্যাদি) ঘাটতি রয়েছে। কোনো কোনো এলাকায় নতুন ভবন নির্মাণ হওয়ার পরও আদালতগুলোতে পর্যাপ্ত সংখ্যক চেয়ার, টেবিল, আলমারিসহ প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র নেই। আবার অনেক ক্ষেত্রে আদালতে বিদ্যমান আসবাবপত্র জরাজীর্ণ এবং ব্যবহারের অনুপোযোগী বলে পরিলক্ষিত হয়েছে। আদালতগুলোতে কম্পিউটারের স্বল্পতা রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে কম্পিউটার পুরনো হওয়ার কারণে বিকল ও ধীর গতিসম্পন্ন হয়ে যায় এবং এগুলো মেরামতে সময় লাগে। ফলে আদালতের কার্যক্রম ব্যাহত হয়। এছাড়া প্রিন্টার ও প্রিন্টারের কালি বা টোনারেরও অপ্রতুলতা রয়েছে। অন্যদিকে অনেক ক্ষেত্রে রায় লেখার জন্য ব্যবহৃত সাদা কাগজ ও নীল কাগজের অপ্রতুলতা রয়েছে। এছাড়া অনেক ক্ষেত্রে আদালতে ইন্টারনেট সুবিধার ঘাটতি রয়েছে।

জনবল ঘাটতি: দেশের অধস্তন আদালতগুলোতে বিপুল সংখ্যক মামলা চলমান রয়েছে এবং প্রতিদিন এই মামলার সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এই বিপুল সংখ্যক মামলার কর্মভার পরিচালনার জন্য সার্বিকভাবে অধস্তন আদালতগুলোতে পর্যাপ্ত জনবলের স্বল্পতা রয়েছে। মামলার সংখ্যার তুলনায় বিচারকের ঘাটতি রয়েছে এবং কাজের চাপের তুলনায় অন্যান্য সহায়ক কর্মচারীর সংখ্যাও অপ্রতুল। মামলার সংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে জনবলের সংখ্যা সে হারে বৃদ্ধি পায়নি। আবার সময়ের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আদালত সৃষ্টি করা হলেও সে আদালতগুলোর (ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল, ইত্যাদি) জন্য প্রয়োজনীয় জনবল বরাদ্দ দেওয়া হয়নি। বাংলাদেশে ১০ লক্ষ মানুষের জন্য মাত্র ১০ জন বিচারক রয়েছেন। গবেষণার আওতাভুক্ত আদালতগুলো থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে, গবেষণার আওতাভুক্ত জেলাগুলোর ৬২১টি আদালতে ১১৪ জন বিচারকের সাময়িক ঘাটতি রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কোনো আদালতের বিচারক বদলি হয়ে গেছেন কিংবা অবসর গ্রহণের কারণে চলে গেছেন কিন্তু উক্ত পদগুলোতে সাথে সাথে নতুন বিচারকদের পদায়ন না করায় পদগুলো সাময়িকভাবে শূন্য রয়েছে। এছাড়া আরও দেখা যায় যে, কিছু আদালতের বিচারকরগণ প্রশিক্ষণ ও ছুটিতে (মাতৃত্বকালীন ছুটিসহ অন্যান্য ছুটি) থাকায় উক্ত পদগুলোও সাময়িকভাবে খালি রয়েছে। এ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, অন্য একজন বিচারককে ভারপ্রাপ্ত বিচারক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। ফলে সেসব বিচারককে একাধিক আদালতের কার্য সম্পাদন করতে হয় এবং নিজ দায়িত্বের পাশাপাশি অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত আদালতের সকল কাজ যথাযথভাবে সম্পাদন করা অনেকাংশে কঠিন হয়ে পড়ে।

গবেষণার আওতাভুক্ত আদালতগুলোর সবকটিতেই সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারীর ঘাটতি রয়েছে এবং আদালতগুলোতে ৫৭৯ জন সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারী কম রয়েছে। বিভিন্ন পদে কর্মচারী (যেমন- স্টেনোগ্রাফার, অ্যাকাউন্ট্যান্ট, জারিকারক ইত্যাদি) সংখ্যা কম বা পদ শূন্য রয়েছে। এছাড়া আদালতগুলোতে মামলার সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য রেখে কর্মচারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়নি। জনবল কম থাকায় সকল পর্যায়ে কাজের চাপ বৃদ্ধি পায় এবং কিছু ক্ষেত্রে কর্ম সম্পাদনে ধীরগতি আসে। কাজের চাপ সামলানোর জন্য কর্মচারী কর্তৃক অনানুষ্ঠানিকভাবে উমেদারদের কাজে যুক্ত করার প্রবণতা দেখা যায়।

প্রশিক্ষণের ঘাটতি: বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রদত্ত প্রশিক্ষণের সংখ্যা পর্যাপ্ত নয় বিশেষ করে বিশেষায়িত আইনের (যেমন- হিল ট্রাক্টস ম্যানুয়াল, সাইবার আইন ইত্যাদি) ওপর প্রশিক্ষণ পর্যাপ্ত নয়। এছাড়া প্রশিক্ষণ পাওয়ার জন্য দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত বিচারকদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পেতে এক বছরের অধিক সময় লেগে যায়। অন্যদিকে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে অভিযোগ রয়েছে যে, কখনো কখনো এক ব্যক্তি এক বছরে একাধিক প্রশিক্ষণ পান আবার অনেকে দীর্ঘদিন কোনো প্রশিক্ষণই পান না। অন্যদিকে আদালতের

কর্মচারীদের জন্য খুব কম সংখ্যক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয় যা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। স্থানীয়ভাবে কর্মচারীদের জন্য বছরে একটি কর্মশালা বা প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকে যেখানে বিচারকগণ তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। কিন্তু সেটিও প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত নয়। একইভাবে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের জন্যও খুব কম সংখ্যক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয় যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। আবার পিপি ও জিপিদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকলেও অন্যান্য পর্যায়ের রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের (যেমন- এপিপি বা এজিপি) জন্য প্রশিক্ষণের কোনো ব্যবস্থা নেই। এছাড়া আইনজীবীদেও জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও অনেক কম।

বিচারক ও কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতিতে চ্যালেঞ্জ: বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে কিছুটা দীর্ঘসূত্রতা রয়েছে। এছাড়া কিছু ক্ষেত্রে বিচারকদের বদলি ও পদোন্নতি প্রক্রিয়াতেও দীর্ঘসূত্রতা রয়েছে। একজন বিচারক বদলি হওয়ার পর উক্ত পদে নতুন বিচারক পদায়নেও অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় লেগে যায়। কিছু ক্ষেত্রে বিচারকদের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন জেলা জজ কর্তৃক নিয়মিতভাবে ও সঠিক সময়ে সুপ্রীমকোর্টে পাঠানো হয় না। আবার কিছু ক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের তদবির না শোনায় বিচারকদের বদলি ও বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদনে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। যেমন- শাস্তি হিসেবে তাৎক্ষণিক বদলি, কম নম্বর প্রদান ইত্যাদি। ফলে অনেক ক্ষেত্রে পদোন্নতি বাধাগ্রস্ত হয়। অন্যদিকে কিছু ক্ষেত্রে বিচারকদের বদলিতে অনিয়ম বা দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে, অনেক ক্ষেত্রে বদলির জন্য প্রভাব বিস্তার বা তদবির পরিলক্ষিত হয়। কিছু ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্ট রেজিস্ট্রি ও মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে ভালো সম্পর্ক, আত্মীয়তার সম্পর্ক, রাজনৈতিক যোগাযোগ বা প্রভাবের মাধ্যমে পছন্দনীয় স্থানে বদলি নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। অধস্তন আদালতে সহায়ক কর্মচারী নিয়োগে তদবির, নিয়মবহির্ভূত অর্থের লেনদেন, বিচারিক কার্যক্রমে সংশ্লিষ্টতা থাকা সত্ত্বেও বিচারিক সার্ভিসের সুবিধা না পাওয়াসহ বিভিন্ন প্রকার চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। নিয়োগের জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে নিয়োগ প্রদানের জন্য তদবির আসা এবং সে অনুযায়ী নিয়োগ দেওয়ারও অভিযোগ রয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে নিয়োগ প্রদানে নিয়মবহির্ভূত অর্থের লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে পদের গুরুত্ব ও এলাকাভেদে প্রায় তিন লক্ষ টাকা থেকে ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত নিয়ম বহির্ভূতভাবে লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে। অন্যদিকে কোনো কোনো জেলায় কর্মচারি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কোর্ট কর্মচারী ও মন্ত্রণালয়ের প্রভাবশালী কর্মকর্তাদের যোগসাজশের মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ পাওয়া যায়। কর্মচারীদের নিয়মিত বদলি হয় না। কর্মচারি বদলির ক্ষেত্রেও তদবির ও নিয়মবহির্ভূত আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া কিছু বিশেষ আদালত (যে আদালতে মামলা বেশি বা নিজ এলাকার এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত ইত্যাদি, যেখানে দুর্নীতির সুযোগ পাওয়া যেতে পারে) বা শাখায় (নকল বিভাগ) পদায়ন পাওয়ার জন্য কর্মচারীদের মধ্যে উৎসাহ দেখা যায়। সার্বিকভাবে কর্মচারীদের পদোন্নতির সুযোগ কম।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের নিয়োগে চ্যালেঞ্জ: অনেক ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগ দেওয়া হয় এবং মেধা ও অভিজ্ঞতার চেয়ে রাজনৈতিক পরিচয়ই প্রাধান্য পায়। অনেক ক্ষেত্রেই কর্মরত রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা রাজনৈতিক সংগঠনের বিভিন্ন পদে রয়েছেন। কিছু ক্ষেত্রে নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতার শর্ত পূরণ না করেও নিয়োগ প্রদানের অভিযোগ রয়েছে।

আইনজীবীদের সনদ প্রদানে চ্যালেঞ্জ: কিছু ক্ষেত্রে যথাযথভাবে যোগ্যতাসম্পন্ন নয় এমন ব্যক্তিও আইন চর্চা করার অনুমতি পেয়ে থাকেন। আইনজীবীদের সনদ প্রাপ্তির বিষয়ে অভিযোগ রয়েছে যে, কিছু ক্ষেত্রে লাইসেন্স পাওয়ার ক্ষেত্রে বার কাউন্সিলে নিয়ম বহির্ভূত অর্থের আদান প্রদান হয়। কিছু ক্ষেত্রে কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতক পর্যায়ের এবং ল' কলেজ আইন শিক্ষার সনদ প্রদান করেছে যা অনেক ক্ষেত্রেই মানসম্পন্ন নয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। কিছু ক্ষেত্রে এরূপ ডিগ্রীধারী ব্যক্তিরা আইন চর্চার সনদপ্রাপ্ত হয়ে আইন পেশায় যুক্ত হচ্ছেন যা কিছু ক্ষেত্রে সততার সাথে আইন চর্চায় ঝুঁকি সৃষ্টি করে বলে তথ্যদাতাদের অভিমত। এছাড়া এ বিষয়ে হাইকোর্ট কর্তৃক আইন শিক্ষা এবং আইনজীবীর সনদ প্রাপ্তি বিষয়ক নির্দেশনা রয়েছে।

৩.২ অধস্তন আদালত ব্যবস্থায় জবাবদিহিতা

তদারকি ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনায় ঘাটতি: কিছু ক্ষেত্রে বিচারক ও সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের (আইনজীবী, সরকারী কৌঁসুলী, পাবলিক প্রসিকিউটর) জবাবদিহিতার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। কোনো কোনো আদালতে দীর্ঘসময় আর্থিক নিরীক্ষা না হওয়ার তথ্য পাওয়া যায়। আদালতের আর্থিক জবাবদিহিতা নিশ্চিতে মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় কর্তৃক পরিদর্শন করার নিয়ম আছে। কিন্তু এ ধরনের পরিদর্শন নিয়মিত বা প্রতিবছর হয় না। এছাড়া কিছু ক্ষেত্রে বিচারকদের কার্যক্রম তদারকিতে চ্যালেঞ্জ পরিলক্ষিত হয়। কিছু ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্টের নানা ধরনের নির্দেশনা অনুসরণ না করা এবং তা যথাযথভাবে তদারকি না হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। যেমন- নির্দেশনা সত্ত্বেও যথেষ্ট সময় এজলাসে না বসা, কর্মস্থল ত্যাগ করা, বৃহস্পতিবার দ্রুত কার্যালয় ত্যাগ করা ও রবিবারে দেরি করে আদালতে আসা ইত্যাদি। অন্যদিকে বিচারকদের জন্য নির্ধারিত বিচারিক নীতিমালায়ও বিচারকদের জন্য আচরণবিধি বর্ণিত রয়েছে। বিচারকদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি-অনিয়ম বা আচরণবিধি লঙ্ঘনেরও অভিযোগ পাওয়া যায়। অপরদিকে একজন বিচারকের ভয়-ভীতির উর্ধ্বে থেকে বিচারকার্য সম্পাদন করার বিধান থাকলেও কিছু ক্ষেত্রে বিচারকদের ওপর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের চাপসহ অন্যান্য চাপ কাজ করায় কিছু ক্ষেত্রে ঝুঁকি সৃষ্টি হয় বলে তথ্যদাতারা জানিয়েছেন। কিছু ক্ষেত্রে আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে তাৎক্ষণিক কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করার অভিযোগ পাওয়া যায়। অপরদিকে স্থানীয়ভাবে অধস্তন আদালতের সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তদারকি করার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট আদালতের বিচারক এবং জেলা জজ বা সংশ্লিষ্ট আদালত প্রধানের উপর ন্যাস্ত। তবে সহায়ক কর্মকর্তা-কমচারীদের কার্যক্রম তদারকিতে ঘাটতি রয়েছে। অধস্তন আদালতের বিভিন্ন কাজের জন্য সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ গ্রহণের বিষয়টি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিয়মে পরিণত হয়েছে বলে

অভিযোগ পাওয়া গেছে। এছাড়া অধস্তন আদালতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শাখা (যেমন- নেজারত, রেকর্ডরুম, নকল খানা, মালখানা ইত্যাদি) নিয়মিত পরিদর্শনের ঘাটতি রয়েছে। এছাড়া স্বপ্রণোদিতভাবে অনিয়ম দুর্নীতি বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে ঘাটতি রয়েছে।

এ গবেষণায় রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী ও আইনজীবীদের কার্যক্রম তদারকিতে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগের ফলে কিছু ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ফলপ্রসূ হয় না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এছাড়া বাংলাদেশ বার কাউন্সিল থেকে আইনজীবীদের আচরণ পরিবীক্ষণের ঘাটতি রয়েছে। স্থানীয়ভাবে আইনজীবী সমিতি কিছু ক্ষেত্রে তদারকি করলেও আইনজীবীদের স্বার্থ নিশ্চিতেই বেশি তৎপর থাকে বলে অভিযোগ রয়েছে। আইনজীবী সমিতি ও বার কাউন্সিলের সদস্যরা আইনজীবীদের ভোটে নির্বাচিত হন এবং কোনো আইনজীবীর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে নির্বাচনের মতো রাজনৈতিক স্বার্থের দ্বন্দ্ব কাজ করে।

বাংলাদেশের অধস্তন আদালতসমূহে অভিযোগ প্রদানের আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থার ঘাটতি রয়েছে। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আদালতগুলোতে অভিযোগ প্রদানের জন্য কোনো প্রকার অভিযোগ বাক্স বা কোনো অভিযোগ কেন্দ্র পরিলক্ষিত হয়নি। এছাড়া অভিযোগ যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করার জন্য কোনো রেজিস্টারও সংরক্ষণ করা হয় না। সংশ্লিষ্ট আদালতসমূহের প্রধান বিচারকের নিকট সংশ্লিষ্ট বিষয়ে লিখিত বা মৌখিক অভিযোগ প্রদান করা যায়। তবে এর জন্য নির্ধারিত কোনো ফরম নেই; হাতে লিখে এ ধরনের অভিযোগ দায়ের করতে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভুক্তভোগীরা কোনো ধরনের অভিযোগ জানান না বলে তথ্য পাওয়া গেছে। অভিযোগ করার পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত না থাকা এবং নানা শঙ্কার কারণে তারা অভিযোগ প্রদান হতে বিরত থাকেন বলে উত্তরদাতারা জানিয়েছেন।

৩.৩ অধস্তন আদালত ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা

স্বচ্ছতার ঘাটতি: আদালতগুলো পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, কোনো আদালত প্রাঙ্গণেই আদালতের সেবা বা মামলা সংক্রান্ত সাধারণ তথ্য সম্বলিত কোনো তথ্য বোর্ড বা সিটিজেন চার্টার নেই। এছাড়া কোনো তথ্য কীভাবে কোন জায়গায় পাওয়া যাবে সে সম্পর্কেও কোনো দিক নির্দেশনা নেই। গবেষণার আওতাভুক্ত আদালতগুলোতে কোনো তথ্য কেন্দ্র দেখা যায়নি। তবে কিছু এলাকার নতুন আদালত ভবনে তথ্য কেন্দ্র হিসেবে একটি অংশকে চিহ্নিত করা হলেও সেগুলো পূর্ণাঙ্গরূপে চালু হয়নি বা কার্যকর নয়। এছাড়া গবেষণার আওতাভুক্ত কোনো এলাকার আদালত প্রাঙ্গণ বা ভবনে দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তার নাম সম্বলিত বোর্ড টাঙ্গানো দেখা যায়নি। দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তাগণ জানিয়েছেন যে, তথ্য আইনের আওতায় তথ্য প্রাপ্তির আবেদন খুব কম আসে। ফলে তথ্য প্রদানের রেজিস্টার আনুষ্ঠানিকভাবে সংরক্ষণ করা হয় না। বাংলাদেশের অধস্তন আদালতসমূহে কিছু ক্ষেত্রে এখনো পুরোনো ও ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে তথ্য সংরক্ষণ করা হয়। এছাড়া মামলার নথি বা রের্কড সংরক্ষণে নানা সীমাবদ্ধতার কারণে দ্রুত তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয় না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এবং এটুআই প্রোগ্রামের নেতৃত্বে ও তত্ত্বাবধানে ২০১৬ সালে বিচার বিভাগীয় তথ্য বাতায়ন নামক একটি ওয়েব পোর্টাল যাত্রা শুরু করেছে। এতে দেশের প্রত্যেক জেলার সকল আদালতসমূহের তথ্য রয়েছে। তবে এ ওয়েব পোর্টালে প্রয়োজনীয় কিছু তথ্য (যেমন- মামলার পরিসংখ্যান) অনুপস্থিত রয়েছে। এছাড়া অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি (যেমন- বার্ষিক প্রতিবেদন, মামলার কার্যতালিকা) এবং কিছু তথ্য হালনাগাদকৃত অবস্থায় নেই। প্রতিবছর অধস্তন আদালতগুলোর কার্যক্রমের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হলেও সকল আদালতের বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত অবস্থায় নেই। এছাড়া দেশের সকল আদালতের কার্যক্রম নিয়ে অধস্তন আদালতের জন্য সমন্বিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয় না।

৩.৪ অধস্তন আদালত ব্যবস্থায় শুদ্ধাচার চর্চা

প্রতারণা ও জালিয়াতি: একটি মামলা পরিচালনার শুরু থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে বিচারপ্রার্থীরা নানা ধরনের ব্যক্তিদের (দালাল, আইনজীবী, মুহুরী, আদালতের কর্মচারী প্রভৃতি) দ্বারা প্রতারাণার শিকার হচ্ছেন। আদালত প্রাঙ্গণে এক শ্রেণীর দালালের আনাগোনা দেখা যায় এবং আইনজীবীদের নিকট যাওয়ার পূর্বেই বিচারপ্রার্থীরা দালালদের খপ্পরে পড়েন এবং প্রতারিত হন। আদালতে মামলা সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজের জন্য নির্ধারিত সরকারি ফি বা খরচের বাইরেও সংশ্লিষ্ট অনেককে অর্থ প্রদান করতে হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই অর্থ আইনজীবী বা তাদের মুহুরীর মাধ্যমে প্রদান করা হয়। সে অর্থ আইনজীবী বা মুহুরীরা বিচারপ্রার্থীদের নিকট থেকেই নিয়ে নেন। আইনজীবীদের অনেকে বিভিন্ন কাজের জন্য প্রকৃতভাবে যে অর্থ খরচ হচ্ছে তার থেকে অনেক বেশি অর্থ বিচারপ্রার্থীদের নিকট থেকে দাবি করেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। যেমন- হয়তো যে কাজ ৪০০ টাকায় হয়ে যাবে সে কাজের জন্য ১০০০ টাকা পর্যন্ত নেওয়া হয়। কিছু আইনজীবী ও আইনজীবীর সহকারীরা অতিরিক্ত অর্থ নেওয়ার জন্য বিচারপ্রার্থীদের মামলার শুনানীর তারিখ সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য দেন বা ফলস ডেট দেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এছাড়া অনেক ক্ষেত্রে আইনজীবীরা বিচারক তার পরিচিত বা বিচারকের সাথে ভালো সম্পর্ক আছে এবং রায় ম্যানেজ করে দেওয়া যাবে বা পক্ষে করে দেওয়া যাবে এসব বলে বিচারপ্রার্থীদের প্রলুব্ধ করার মাধ্যমে প্রতারিত করেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। আরও অভিযোগ পাওয়া গেছে যে, কিছু ক্ষেত্রে মামলার দুই পক্ষের আইনজীবীরা টাকার বিনিময়ে সমাঝোতা বা যোগসাজশ করে ফেলেন বা একপক্ষের আইনজীবী অন্যপক্ষের সাথে আঁতাত করেন যা বিচারপ্রার্থী জানতে পারেন না। রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের ক্ষেত্রেও এমন অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া কিছু ক্ষেত্রে মামলার কাগজপত্র ও স্বাক্ষর জাল করে বিভিন্ন আদেশ বা রায় পরিবর্তনের অভিযোগ রয়েছে।

দায়িত্ব পালনে অবহেলা: কিছু ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ যথাযথভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করেন না বা দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। অধস্তন আদালতের বিচারকদের হাইকোর্টের নির্দেশনা মোতাবেক কর্মঘন্টার অধিকাংশ সময়ই এজলাসে থাকার কথা থাকলেও কিছু ক্ষেত্রে অনেক বিচারক সেই পরিমাণ সময় এজলাসে দেন না। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে, অনেক এলাকার আদালতের কার্যক্রম

অনেক দেরিতে শুরু হয়। ফলে সেখানে বিচারের জন্য কর্মঘন্টা কমে যায়। মামলা সংক্রান্ত কার্যসম্পাদনের সাথে জড়িত কর্মচারীদের একাংশ কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের নির্ধারিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন না। যেমন- সমন জারি হওয়া মামলার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এবং এর দায়িত্বে থাকে সমন জারিকারক বা প্রসেস সার্ভার। কিন্তু এই জারিকারকরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে সমনগুলো জারি করেন না বরং এ মর্মে তারা অর্থ দাবি করেন। আবার ব্যবসায়িক (মামলা শেষ হয়ে গেলে উক্ত মামলা থেকে তার আয় বন্ধ হয়ে যাবে) মানসিকতা থেকে কিছু আইনজীবী মামলা শেষ করতে আগ্রহী হন না, মামলার প্রতি গুরুত্ব দেন না এবং ইচ্ছাকৃতভাবে মামলা দীর্ঘায়িত করেন। কিছু ক্ষেত্রে আইনজীবীরা তাদের মক্কেলদেরকে পূর্ণাঙ্গ তথ্য দেন না। আইনজীবীরা তাদের মক্কেলদেরকে মামলা জেতার সম্ভাবনা, ঝুঁকি ও মামলার অগ্রগতি সম্পর্কেও ভালোভাবে অবগত করেন না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এছাড়া অনেক ক্ষেত্রে মামলার শুনানীর সময় রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা (বিশেষ করে এপিপি বা এজিপি) আদালতে উপস্থিত থাকেন না বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে।

ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ লেনদেন: আদালতে একটি মামলার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন কাজ করানোর জন্য বা কাজ দ্রুত করানোর জন্য বিভিন্ন ব্যক্তিদের (যেমন- আদালতের কর্মচারী, রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী, আইনজীবী, আইনজীবীর সহকারী বা মুহুরী ইত্যাদি) ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ প্রদান করতে হয় বা মামলা পরিচালনার প্রকৃত বা প্রাক্কলিত মূল্য ব্যতীত অতিরিক্ত অনেক অর্থ প্রদান করতে হয় বলে ব্যাপক অভিযোগ পাওয়া গেছে। দীর্ঘদিন যাবৎ এ ধরনের নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ নেওয়ার সংস্কৃতি প্রচলিত থাকায় এটি একটি আবশ্যিক নিয়ম বা প্রথায় পরিণত হয়েছে অভিযোগ পাওয়া গেছে। অর্থ ছাড়া কোনো কাজ হয় না বা হলেও তা সময়মত সম্পন্ন হয় না বলে ব্যাপক অভিযোগ লক্ষ করা গেছে। বিভিন্ন কাজে যেমন- মামলা দায়েরের জন্য, হাজিরা দেওয়া, কোনো নথি দেখা, শুনানীর জন্য তারিখ (লং ডেট বা শর্ট ডেট অর্থাৎ শুনানীর তারিখ পিছিয়ে নেওয়া বা এগিয়ে আনার জন্য) নেওয়া, জবানবন্দি গ্রহণের পর স্বাক্ষর দেওয়া, মামলার মধ্যবর্তী পর্যায়ে কোনো পিটিশন দেওয়া, ইনজানক্শনের এফিডেফিট করা, কোনো ডকুমেন্টের সত্যায়িত কপি উত্তোলন, সমন বা নোটিশ জারি করার জন্য, এজাহারের কপি উত্তোলন, বেলবন্ড জমা, রায়ের জাবেদা কপি উত্তোলন ইত্যাদির জন্য আদালতের বিভিন্ন কর্মচারীদের অনেকটা বাধ্যতামূলকভাবে টাকা দিতে হয়। টাকা না দিলে কাজ না হওয়া বা দেরিতে হওয়ার ঝুঁকি থাকে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। তবে এই ধরনের অর্থ নেওয়ার পরিমাণ কোথাও নির্দিষ্ট নয় বরং তা মামলার ধরন, গুরুত্ব, বিবাদী বা আসামীর সংখ্যা, কাজের জরুরী ভিত্তি, বিচারপ্রার্থীর সামর্থ্য ও এলাকার ওপর নির্ভর করে। কিছু কাজের জন্য অর্থের পরিমাণের পরিসীমা নির্ধারিত রয়েছে এবং এলাকাভেদে অর্থের পরিমাণের ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা যায়। যেমন- গবেষণার আওতাভুক্ত কয়েকটি এলাকা অর্থনৈতিকভাবে উন্নত এবং বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণে ঐ এলাকাগুলোতে অর্থের লেনদেনের পরিমাণ অন্য এলাকার তুলনায় বেশি।

দেওয়ানী মামলার ক্ষেত্রে বিবাদীর ওপর সমন জারি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ সমন যথাযথভাবে জারি না হলে তা মামলাকে দীর্ঘসূত্রতার মধ্যে ফেলে দিতে পারে বা মামলার পক্ষগণ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। এ কাজে তুলনামূলকভাবে বড় অংকের অর্থের লেনদেন হয়ে থাকে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। নিয়ম অনুযায়ী আদালত সমন জারির আদেশ দিলে সমনের কপি নিয়ে জারিকারক বা প্রসেস সার্ভার বিবাদী পক্ষের নিকট যাবেন এবং তাকে সমনের কাগজ দিয়ে মামলা সম্পর্কে অবগত করে সমন যথাযথভাবে জারি হয়েছে এ মর্মে নথিভুক্ত করবেন। তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে, সমন যথাযথভাবে জারির জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে ২০০-১০,০০০ টাকা পর্যন্ত দিতে হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে জারিকারক বাদী এবং বিবাদী উভয়ের বাড়িতেই যান এবং টাকা দাবী করেন। এছাড়া নিষেধাজ্ঞার আদেশ প্রক্রিয়াকরণ ও নোটিশ জারিতে টাকা দিতে হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। অন্যদিকে শুনানীর দিন সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করার পর নথিতে সাক্ষীর স্বাক্ষর ও অফিশিয়াল সীল দেওয়ার সময়ও সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে টাকা (৫০-১০০০) দিতে হয়। এছাড়া পরবর্তী সময়ে যদি মামলার প্রয়োজনে সাক্ষীর জেরা/জবানবন্দীর নথি দেখার প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে কপি তোলার জন্য ১৫০-১০০০ টাকা পর্যন্ত দিতে হয়। একইভাবে মামলার কোনো নথি দেখার জন্য এবং আদালতে নথি উপস্থাপনের জন্যও টাকা দিতে হয়। রায়ের নকল বা জাবেদা কপি উত্তোলনের ক্ষেত্রে তুলনামূলক বেশি অর্থ লেনদেন হয় অভিযোগ পাওয়া গেছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, নকলখানায় রায়ের নকল বা জাবেদা কপি উত্তোলনের আবেদন অনেক বেশি থাকে এবং সবাই জরুরী ভিত্তিতে এ কপি চান। সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী অফিসেই এই কপি টাইপ করে বা প্রস্তুত করে সরবরাহ করার কথা থাকলেও তা বাইরে থেকে ফলিও (নির্ধারিত কাগজ) কিনে এবং অনেক সময় বাইরে থেকে টাইপ করে এনে সরবরাহ করা হয়। রায়ের নকল বা জাবেদা কপি উত্তোলনের জন্য নির্ধারিত সরকারি ফি'র বাইরে ২০০-৫০০০ টাকা পর্যন্ত দিতে হয়েছে বলে তথ্য পাওয়া গেছে। তবে এই টাকার পরিমাণ রায়ের আকার (কত পৃষ্ঠার রায়), ফলিও সংখ্যা (ফলিও প্রতি রেট নির্ধারিত থাকে) ও জরুরি প্রয়োজনের ওপর নির্ভর করে।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরাও বিচারপ্রার্থীদের নিকট থেকে বিভিন্ন কাজের অজুহাতে অর্থ আদায় করে থাকেন। কোনো ক্ষেত্রে বাদী ও বিবাদী উভয়ের কাছ থেকে অর্থ আদায় করেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। যেমন- সাক্ষীর শুনানী করার জন্য, কোন নথি সিন করার জন্য, জেরা করার সময় বা যুক্তি তর্ক উপস্থাপনের সময় যথাযথ ভূমিকা না রাখাসহ বিভিন্ন কাজের জন্য তাদের ঘুষ বা অর্থ দিতে হয়। এমনকি মামলার দু'পক্ষ আপোষ করে মামলা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিলেও রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের অর্থ প্রদান করতে হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এসকল কাজের জন্য ২০০- ৬,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত লেনদেন হয় বলে তথ্যদাতারা অভিযোগ করেছেন। এছাড়া মামলার বিভিন্ন কাজের যেমন- ওয়ারেন্ট কপি থানায় পাঠানো, ওকালতনামা সনাক্ত, জামিননামা সংক্রান্ত, বিভিন্ন নথি উত্তোলন, আসামিকে খাবার বা কোনো সুবিধা দেওয়ার জন্য ইত্যাদির জন্য পুলিশদের অর্থ প্রদান করতে হয় এবং এক্ষেত্রে ২০০-২০,০০০ টাকা পর্যন্ত লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে।

অপরদিকে কিছু ক্ষেত্রে অর্থ লেনদেনের মাধ্যমে মামলার আদেশ বা রায় প্রভাবিত করা হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। সেক্ষেত্রে ২০,০০০ - ১০,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত লেনদেন হয়ে থাকে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এছাড়া কয়েকটি এলাকায় অভিযোগ পাওয়া গেছে যে, মামলার আদেশ বা রায় প্রভাবিত করার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তিদের যোগসাজশ কাজ করে। অনেক ক্ষেত্রেই বিচারকের নাম করে টাকা নেওয়া হয় এবং প্রকৃতপক্ষে বিচারক তার কিছুই জানেন না। এছাড়া কিছু ক্ষেত্রে মামলা প্রত্যাহার বা আইনজীবী পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রে আইনজীবীর স্বাক্ষর প্রয়োজন হলে স্বাক্ষর দিতে না চাওয়া এবং অর্থ দাবি করা হয়। কিছু ক্ষেত্রে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলায় আদালত কর্তৃক স্ত্রীর মোহরানার দাবি পরিশোধের আদেশের পর মোহরানার টাকা গ্রহণের সময় জোরপূর্বক উক্ত টাকার অংশ (আইনজীবী ফি'র বাইরে) আদায় করা হয়। কিছু ক্ষেত্রে আইনজীবী ও তাদের সহকারীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ব্যক্তির (যেমন- বিচারক, পিপি/জিপি বা আদালতের কর্মচারী ইত্যাদি) নাম ভাঙ্গিয়ে অতিরিক্ত অর্থ দাবি করা হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে এই গবেষণায় প্রাপ্ত অর্থ লেনদেন মূখ্য তথ্যদাতাদের প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী সন্নিবেশিত। তবে এই আর্থিক লেনদেন ব্যতীত যে কাজ হতে পারে না তা বোঝায় না। তবে এই তথ্য বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে কি পরিমাণ অর্থ লেনদেন সচারচর ঘটে থাকে তার একটি নির্দেশনা প্রদান করে।

প্রভাব বিস্তার ও অন্যান্য চাপ: আদালতের বিভিন্ন কার্যক্রমকে প্রভাবিত করার জন্য প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ পাওয়া গেছে। কিছু ক্ষেত্রে আদালতের বিভিন্ন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের (যেমন- বিচারক, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী) নানা ধরনের তদবির, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের চাপ বা রাজনৈতিক চাপ ইত্যাদির সম্মুখীন হতে হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিচারকদের নিকট কিছু ক্ষেত্রে বিভিন্ন দিক থেকে বিচারিক কার্যক্রম বা মামলার কার্যক্রম সম্পর্কিত (জামিন দেওয়া, শাস্তি দেওয়া, কারো পক্ষে রায় দেওয়া, কর্মচারী নিয়োগ ইত্যাদি) তদবির ও চাপ আসে। তদবির না শুনলে অনেক ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। যেমন- কর্মদক্ষতা মূল্যায়নে নিরপেক্ষ না থাকা, শাস্তিমূলক বদলি, সাময়িক বরখাস্ত, বিভাগীয় তদন্ত, হয়রানি, বাজেট ঠিকমতো না দেওয়া, অবসর ভাতা পেতে কষ্ট হওয়া, বদলির অর্ডার (জিও) না হওয়া ইত্যাদি। আবার কিছু ক্ষেত্রে আদালত পরিদর্শনের সময় এমনকি ব্যক্তিগত ভ্রমণকালেও (নিজ জেলা বা পর্যটন এলাকা) অতিরিক্ত প্রটোকল ও অন্যান্য সুবিধাদির ব্যবস্থা করতে হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে অভিযোগ পাওয়া গেছে। অন্যদিকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও সামাজিক সংবেদনশীল বিষয়ে বিচারকালে বিচারকেরা মানসিক চাপ অনুভব করেন এবং আইনজীবীদের আদালত বর্জন ও ভাংচুর ইত্যাদি বিষয়ও এক ধরনের মানসিক চাপ সৃষ্টি করে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

৩.৫ জাতীয় আইনগত সহায়তা সেবা সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ

কিছু ক্ষেত্রে আইনগত সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত নানা ইতিবাচক উদ্যোগ ও অনুকরণীয় ভাল দৃষ্টান্ত থাকা সত্ত্বেও আইনগত সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে কিছু চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। অনেক ক্ষেত্রে যথাযথভাবে আইনগত সহায়তা প্রদানে জন্য জনবল সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। আইনগত সহায়তা প্রার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে লিগ্যাল এইডের ব্যয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে বাজেট ঘাটতি বিদ্যমান। অনেক এলাকায় দেখা গেছে যে, জেলা লিগ্যাল এইড অফিসের জন্য পর্যাপ্ত অবকাঠামো সুবিধা নেই। আইনগত সহায়তা প্রাপ্তিতে বিচারপ্রার্থীরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুর্নীতির শিকার হন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। প্যানেল আইনজীবীরা অনেক সময় আইনগত সহায়তা প্রার্থীদের নিকট থেকে নিয়বহির্ভূতভাবে টাকা দাবি করেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। কিছু ক্ষেত্রে বিবাদী ও বাদী উভয় পক্ষের নিকট হতে টাকা নেওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়। আইনগত সহায়তার সেবাসমূহ সম্পর্কে প্রচারণার ঘাটতি এবং বিচারপ্রার্থীদের মধ্যে এ সম্পর্কে সচেনতার অভাব রয়েছে। আবার প্রচারণার মাধ্যমে জনগণের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করার বিষয়টি অনেকটা শহরকেন্দ্রিক।

৪. অধস্তন আদালত ব্যবস্থায় সুশাসনের ঘাটতির কারণ-ফলাফল-প্রভাব বিশ্লেষণ

কারণ	ফলাফল	প্রভাব
• দ্বৈত প্রতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা • প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা (আইনী, অবকাঠামো, লজিস্টিকস, বাজেট, জনবল, প্রশিক্ষণ ঘাটতি) • কার্যকর জবাবদিহিতার ঘাটতি • স্বচ্ছতা ও তথ্যের উন্মুক্ততার ঘাটতি • মামলার পদ্ধতিগত জটিলতা	• মন্ত্রণালয় এবং সুপ্রীমকোর্টের দ্বন্দ্ব ও টানাপোড়ন • বিচারিক কার্যক্রম ব্যাহত হওয়া • আদালতের প্রশাসনিক কার্যক্রম ব্যাহত হওয়া • মামলার দীর্ঘসূত্রতা ও মামলা জট • দুর্নীতি ও অনিয়ম সংঘটন • বিচারপ্রার্থীদের হয়রানি ও ভোগান্তি • বিচারকদের স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালনে ঝুঁকি সৃষ্টি	• বিচারপ্রার্থীদের ন্যায়বিচারে অভিগম্যতা ব্যাহত হওয়া • বিচারপ্রার্থীরা আর্থিক, শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন • বিচারপ্রার্থীদের আদালতে যাওয়ার ক্ষেত্রে ভীতি সৃষ্টি • ন্যায়বিচার ব্যাহত হওয়ার ঝুঁকি

৫. উপসংহার

সুশাসন এবং সামাজিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে আদালতের ভূমিকা অপরিহার্য। নানা সীমাবদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও অধস্তন আদালতগুলো সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সার্বিকভাবে আদালতের কার্যকরতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন পদক্ষেপ থাকলেও আদালত ব্যবস্থায় সুশাসন নিশ্চিতে এখনও অনেক চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। অধস্তন আদালতের ওপর একইসাথে সুপ্রীম কোর্ট এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান রয়েছে যা কিছু ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কাজে দীর্ঘসূত্রতা, প্রশাসনিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিতের ক্ষেত্রে ঝুঁকি সৃষ্টি করছে। এছাড়া এ গবেষণায় অধস্তন আদালত ব্যবস্থায় অবকাঠামো, লজিস্টিকস, বাজেট, জনবল ও প্রশিক্ষণ ও কার্যকর জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। এসব কারণে কিছু ক্ষেত্রে বিচার ও প্রশাসনিক কাজ ব্যাহত এবং মামলা সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন অংশীজনদের মধ্যে যোগসাজশের মাধ্যমে ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূত অর্থের লেনদেনসহ নানাবিধ দুর্নীতি ও অনিয়ম সংঘটিত হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে বিচারপ্রার্থীদের নানাবিধ হয়রানি ও ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে। গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে আদালত ব্যবস্থায় সুশাসনের ঘাটতির কারণে অনেক ক্ষেত্রে মামলার দীর্ঘসূত্রতা এবং দুর্নীতি সৃষ্টি হচ্ছে। অপরদিকে মামলার দীর্ঘসূত্রতা এবং দুর্নীতি বৃদ্ধি একটি অপরটির পরিপূরক। অর্থাৎ মামলার দীর্ঘসূত্রতার কারণে অনেক ক্ষেত্রে দুর্নীতি সৃষ্টি হচ্ছে আবার দুর্নীতির কারণেও মামলার দীর্ঘসূত্রতার সৃষ্টি হচ্ছে। সর্বোপরি সুশাসনের ঘাটতির কারণে অনেক ক্ষেত্রে বিচারপ্রার্থীদের ন্যায়বিচারে অভিগম্যতা ব্যাহত হচ্ছে।

৬. সুপারিশ

অধস্তন আদালতের সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে পেশাগত উৎকর্ষ বৃদ্ধি, জনগণকে ন্যায়বিচার প্রদান, জনগণের আস্থা বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি আদালত ব্যবস্থায় বিদ্যমান সুশাসনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় টিআইবি নিম্নলিখিত সুপারিশ উপস্থাপন করছে:

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি:

১. অধস্তন আদালতের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান এককভাবে সুপ্রীম কোর্টের ওপর ন্যাস্ত করতে হবে;
২. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন ও আইনি সংস্কার নিশ্চিত করতে হবে;
৩. যথাযথভাবে স্বপ্রণোদিত চাহিদা নিরূপণ সাপেক্ষে অধস্তন আদালতগুলোর জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে - বিভিন্ন ভাতা বর্তমান সময়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে;
৪. দেশের সকল অধস্তন আদালতের জন্য পর্যাপ্ত জনবল, অবকাঠামো, লজিস্টিকস ও আধুনিক প্রযুক্তিগত সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে;
৫. বিচারকদের নিয়োগ প্রক্রিয়া দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করতে হবে;
৬. অধস্তন আদালতের সহায়ক কর্মচারীদের নিয়োগ স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত করতে হবে;
৭. রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের নিয়োগ স্বচ্ছ এবং রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করতে হবে;
৮. বিচারক, কর্মচারী ও রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং প্রশিক্ষণ পাওয়ার ক্ষেত্রে সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে - বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে

স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ:

৯. অধস্তন আদালতের কার্যক্রমে তথ্যের উন্মুক্ততা নিশ্চিতের ব্যবস্থা করতে হবে। এ লক্ষ্যে আদালত প্রাঙ্গণে নাগরিক সনদ প্রবর্তন, পূর্ণাঙ্গ তথ্য ও পরামর্শ কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে;
১০. সকল অধস্তন আদালতের জন্য সমন্বিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হবে;
১১. নিয়মিত বাৎসরিক নিরীক্ষা সম্পন্ন করতে হবে। নিরীক্ষা প্রতিবেদন ও স্বপ্রণোদিত বাৎসরিক হিসাব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে

জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ:

১২. বিচারকদের চাকুরীর শৃঙ্খলা ও আচরণ বিধিমালা দ্রুত গেজেট আকারে প্রকাশ করতে হবে এবং সকল বিচারিক কর্মকর্তাদেরকে আচরণবিধি কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। অধস্তন আদালতের সহায়ক কর্মচারীদের জন্য পৃথক আচরণবিধি প্রণয়ন করতে হবে;
১৩. অধস্তন আদালতের কার্যক্রম এবং সংশ্লিষ্ট বিচারক, কর্মচারী ও রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের আচরণ ও কার্যক্রমের নিয়মিত তদারকি নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে-
    - প্রতিবছর হাইকোর্ট কর্তৃক অধস্তন আদালত পরিদর্শন বা আকস্মিক পরিদর্শন বৃদ্ধি করতে হবে;
    - অধস্তন আদালতের বিভিন্ন কার্যালয় (যেমন- নেজারত, রেকর্ডরুম, নকলখানা, মালখানা ইত্যাদি) নিয়মিত পরিদর্শন ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে;
    - বিচারক এবং আদালত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আয় ও সম্পত্তির বিবরণ প্রতিবছর বাধ্যতামূলকভাবে প্রকাশ এবং হালনাগাদ করতে হবে;
১৪. আইনজীবীদের জবাবদিহিতা বৃদ্ধিতে বার কাউন্সিল, স্থানীয় আইনজীবী সমিতি ও স্থানীয় বিচারিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়মিত তদারকি ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে;

১৫. প্রত্যেক জেলার আদালত প্রাঙ্গণে অভিযোগ বাক্স স্থাপন, অভিযোগ লিপিবদ্ধ করার রেজিস্টার সংরক্ষণ এবং অভিযোগ সমাধানে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে

শুদ্ধাচার চর্চা নিশ্চিতকরণ:

১৬. অধস্তন আদালতের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের যে কোনো দুর্নীতি ও আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে দ্রুততার সাথে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১৭. বিচারকদের স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালনের পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে;

অন্যান্য:

১৮. জাতীয় আইনগত সহায়তার প্রচারণা বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং আইনগত সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ নিরসনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

এ সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের জন্য সুপ্রীম কোর্ট রেজিস্ট্রি, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সরকার ও নাগরিক সমাজকে একসাথে কাজ করতে হবে